পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সমস্যা ও আশু করণীয়
শীর্ষক
গোলটেবিল আলোচনা
২৩ নভেম্বর ২০০৯, সোমবার, ডব্লিউভিএ মিলনায়তন, ধানমন্ডি, ঢাকা
আয়োজনে
কাপেং ফাউন্ডেশন ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সমস্যা ও আশু করণীয়

গৌতম কুমার চাকমা

১। ভূমিকা

২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানার্থে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি নামে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দেশের সংবিধানের আওতায় সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের অধিকার সনদ। এ অধিকার সনদ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষত অনগ্রসর ও বিলুপ্তপ্রায় আদিবাসী পাহাড়ী বা জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের, ভূমি বিরোধ নিস্পত্তির ও ভূমি অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানের এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল অধিবাসীর জনপ্রতিনিধিত্বশীল বিশেষ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ভিত্তিস্বরূপ।

উল্লেখ্য, ঐতিহাসিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী পাহাড়ী বা জুম্ম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চল। প্রাক-ব্রিটিশ উপনিবেশিক আমলে এ অঞ্চলের জুম্ম জনগণ স্বজাতীয় আদিবাসী স্বাধীন রাজন্যবর্গের শাসনাধীনে ছিলেন।

জানা যায়, ১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দে Joa De Barros নামের এক পর্তুগীজ মানচিত্রকরের আঁকা একটি মানচিত্র অনুযায়ী তৎকালীন CHACOMA বা চাকমা রাজ্যের সীমানা ছিল- উত্তরে ফেনী নদী, দক্ষিণে নাম্রে বা নাফ নদী, পূর্বে লুসাই হিলস এবং পশ্চিমে সমুদ্র। অর্থাৎ উক্ত রাজ্য বর্তমান চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। অবশ্য পরে এ রাজ্যের দক্ষিণের ও পশ্চিমের সীমানা কিছু পরিমাণে সংকুচিত হয়।

১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার "ভারত শাসন আইন, ১৮৫৮" প্রণয়ন করে সমগ্র ভারতের শাসনভার হাতে নেয়। অত:পর ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ হতে "জেলা আইন, ১৮৩৬" অনুযায়ী ব্রিটিশ ভারত সাম্রাজ্যকে কয়েক শত জেলায় বিন্যাস করে।

১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে চাকমা রাজার শাসনাধীন ("চাদিগাং" বা "চিটাগং") রাজ্যকে ব্রিটিশ ভারতের আওতাধীন করা হয় এবং Act XXII of 1860 বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে আলাদা জেলা হিসেবে গঠন করা হয়।

১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ ভারত সরকার তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর আদিবাসী জাতিসমূহের ভূমির অধিকার ও স্ব-শাসনের অধিকার রক্ষাকল্পে "Government of India Act (for administration of the backward tracts), 1870" ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাস করে। ইহার আওতায় প্রণীত 'Inner Line Reguation, 1873" এবং "Schedule District Act, 1874" পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলেও প্রয়োগ করে যথাক্রমে বহিরাগতদের পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ আরোপের এবং ভূমি অধিকার ও স্ব-শাসনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য। পরে ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে "পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯০০ (১৯০০ সনের ১ নং বিধি)" পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবর্তন করা হয় এবং ইহাতে পূর্বেকার এ সব বিধানাবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তদুপরি পার্বত্য চট্টগ্রামকে Excluded Area বা পৃথক শাসিত অঞ্চল মর্যাদা প্রদান করা হয়। এক কথায় বলা যায়, ব্রিটিশ শাসনামলে আদিবাসী অধ্যুষিত অপরাপর বিভিন্ন অঞ্চলের ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বরাবরই বিশেষ আইনে শাসিত হয়।

"ভারতের স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭" অনুযায়ী ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে। উক্ত আইনে স্বাধীনতা উত্তরকালে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল ও উহাদের অধিবাসীদের অধিকার রক্ষার বিধান রাখা হয়।

১৯৫৬ সালে ও ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের প্রথম ও দ্বিতীয় সংবিধানে "পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯০০" এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা (যথাক্রমে Excluded Area ও Tribal Area) অক্ষুন্ন রাখা হয়। তবে ১৯৬৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা বাতিল করা হয়। তদুপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি লঙ্ঘন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগতদের বসতি স্থাপন ও ভূমি বেদখলে সরকারীভাবে পৃষ্ঠপোষকতা শুরু হয়।

১৯৭২ সালে প্রণীত দেশের সংবিধানে প্রচলিত আইন হিসাবে "পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯০০" বহাল থাকে। কিন্তু বহিরাগতদের বসতি স্থাপন ও ভূমি বেদখল জোরদার হয়। তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের অপরাপর বিভিন্ন আদিবাসী নেতৃবৃন্দ আদিবাসীদের

সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী তুলে ধরেন। নতুন জাতিরাষ্ট্রের উগ্র জাতীয়তাবাদী ধারণায় উদ্দীপ্ত শাসকগোষ্ঠী সে দাবী প্রত্যাখ্যান করে।

বিশেষত ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল পথ রুদ্ধ হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণ সশস্ত্র আন্দোলনের পথ ধরতে বাধ্য হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বরাবরই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের জন্য আলোচনার পথ খোলা রাখে। ফলশ্রুতিতে ১৯৮৫ সাল হতে তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জেনারেল এরশাদের সরকার, প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সর্বমোট ২৬ (চাব্বিশ) বার আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৯ সালে প্রেসিডেন্ট জেনারেল এরশাদ সরকার পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। পরিশেষে ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের সাথে ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

২। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিষয়াবলী/বৈশিষ্ট্যসমূহ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে একটি প্রস্তাবনা ও চারটি খন্ড রয়েছে। চার খন্ডে বিবৃত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপঃ-

- পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল বিধায় এর বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করা।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। আইন-শৃঙ্খলা, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, পুলিশ (স্থানীয়), কৃষি ও বন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, যুব কল্যাণ ও আদিবাসী (উপজাতীয়) আইন, রীতি বা প্রথা ও সামাজিক বিচারসহ ৩৩টি বিষয় বা কার্যাবলী পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নিকট সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃংখলা ও উন্নয়ন, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদের সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধানের কার্যাবলী ন্যস্ত করা।
- প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী, আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু ও জনসংহতি সমিতির সদস্যদের পুনর্বাসন করা।
- ৬টি সেনানিবাস ব্যতীত সেনা, এপিবি, আনসার ও ভিডিপি'র সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা।
- পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন, প্রথা ও পদ্ধতি অনুসারে ভূমি কমিশনের মাধ্যমে এ অঞ্চলের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করা,
- ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির পর ভূমি জরিপ করা।
- অ-স্থানীয়দের ভূমির ইজারা বাতিল করা।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের একজন উপজাতীয় ব্যক্তিকে মন্ত্রীপদে নিয়োগ করা।
- এ ছাড়া সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ও জনসংহতি সমিতির সদস্যসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার, জনসংহতি সমিতি সদস্যদের অস্ত্র জমাদান, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল প্রকার চাকুরীতে পাহাড়ীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ প্রদান, পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা, উপজাতীয় কোটা সংরক্ষণ করা ইত্যাদি অন্যতম।

৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা ও আশু করণীয়

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের অব্যবহিত পরে তৎকালীন সরকার কর্তৃক চুক্তি মোতাবেক রাংগামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ সংশোধন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয় সংক্রান্ত কার্যবিধিমালা, ১৯৯৮ প্রণয়ন করা হয়। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামে জনপ্রতিনিধিত্বশীল বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্থাপন করে এবং ভারত থেকে পাহাড়ী শরণার্থীদের ফেরৎ নিয়ে আসে।

তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো যেমন- পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ ও ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠা, স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন, সেটেলারদের অনুপ্রবেশ, ভূমি বেদখল ও বসতি সম্প্রসারণ বন্ধকরণ, পাহাড়ী শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ পাহাড়ী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, অস্থায়ী ক্যাম্প সরিয়ে নেওয়া, পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদকে আইন অনুযায়ী ক্ষমতায়ন করে বিশেষ শাসনব্যবস্থা কার্যকর করা, আইন অনুযায়ী স্থায়ী বাসিন্দা নয় এমন সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসন করা ইত্যাদি অদ্যাবধি বাস্তবায়িত হয়নি।

গত ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ৬ জানুয়ারী ২০০৯ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইসতেহারে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে। ক্ষমতায় আসার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিচালনাধীন বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটি, প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স এবং ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন পুনর্গঠন, এক ব্রিগেড সৈন্যসহ ৩৫টি অস্থায়ী ক্যাম্প গুটিয়ে নেয়া ইত্যাদি অন্যতম। এসব পদক্ষেপ মূলতঃ প্রস্তুতিমূলক বলা যায়। চুক্তির প্রায়োগিক বাস্তবায়ন এখনো শুরু হয়নি। পার্বত্যবাসীর প্রত্যাশা যে, নির্বাচনী অঙ্গীকার মোতাবেক বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত মৌলিক বিষয়গুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নে অচিরেই এগিয়ে আসবে। নিম্নে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা ও আশু করণীয় বিষয়াবলী উত্থাপন করা হলঃ-

৩.১। উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ

এই বিধান অনুযায়ী আদিবাসী পাহাড়ী বা জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সমুন্নত রাখার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে এখনো কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

অপরদিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চুক্তির পূর্বেকার নীতি ও কার্যক্রম অনুসরণ অব্যাহতভাবে চলছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ, বসতি স্থাপন, ভূমি বেদখল ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। ১৯৪৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী ও বাঙালী জনসংখ্যানুপাত ছিল শতকরা যথাক্রমে ৯৭.৫ ও ২.৫, ১৯৯৭ সালে আনুমানিক ৫৫ ও ৪৫ এবং বর্তমানে আনুমানিকভাবে ৫১ ও ৪৯ হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক-

(১) সংবিধানে "পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী পাহাড়ী বা জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চল এবং ইহার বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করা হবে" মর্মে সংবিধি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

(২) সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়ী বা জুম্ম সম্পর্কিত অনুকুল নীতি প্রণয়ন করা ও প্রয়োজনে পার্বত্য চট্টগ্রামে ইনার লাইন প্রথা চালু করা।

(৩) সেটেলার বাঙালীদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইবে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন করা; এ লক্ষ্যে-

(ক) সেটেলার বাঙালীদেরকে বর্তমানে রেশন বাবদ প্রদত্ত খাদ্যশস্য পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইবে প্রদানের ব্যবস্থা করা।

(খ) পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসনের জন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক প্রস্তাবিত আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করা।

(৪) সেটেলার বাঙালীদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ ও ভূমি জবরদখল করার চলমান প্রক্রিয়া বন্ধ করা এবং জরবদখলকৃত জমি জুম্মদের নিকট ফেরত দেয়া।

(৫) চুক্তি এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও আঞ্চলিক পরিষদ আইন অনুসরণে পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের ক্ষমতা কেবল সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফের উপর অর্পণ করা।

(৬) স্থায়ী বাসিন্দা নয় এ রকম বাসিন্দাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না করা।

(৭) পার্বত্য জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন ভূমি অধিগ্রহণ, ইজারা বা বন্দোবস্ত প্রদান, ক্রয়-বিক্রয় বা অন্যবিধভাবে হস্তান্তর না করার বিধান যথাযথভাবে কার্যকর করা।

৩.২। সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়ন, সংশোধন ও সংযোজনকরণ

১৯৯৮ সালে চুক্তি মোতাবেক সরকার রাংগামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ সংশোধন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কার্যবিমিালা, ১৯৯৮ প্রণয়ন করা হয়। এতে চুক্তির আইনগত ভিত্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন যাতে যথাযথভাবে কার্যকর হতে পারে তার জন্য সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯০০ ও সংশ্লিষ্ট অপরাপর স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের কোন আইন সংশোধন করেনি। এমনকি সরকার আঞ্চলিক পরিষদ কার্যবিধিমালা প্রণয়ন ও পার্বত্য জেলা পরিষদ কার্যবিমিালা সংশোধন করেনি। এমতাবস্থায় আইন প্রণয়ন বা সংশোধন ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা-

(১) আঞ্চলিক পরিষদ আইন যথাযথভাবে কার্যকর করার লক্ষ্যে ২০০০ সালে প্রস্তুতকৃত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কার্যবিধিমালা, ২০০০' এর খসড়া চূড়ান্ত করা এবং আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক যথাক্রমে ১৯৯৯ সালে ও ২০০০ সালে প্রণীত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সংযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত প্রবিধানমালা, ১৯৯৯ ও 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কার্যপ্রণালী প্রবিনমালা, ২০০০' এর উপর সরকারের পরামর্শ প্রদান করা।

(২) পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন কার্যকর করার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যপ্রণালী বিধিমালা, ১৯৮৯ সংশোধন করা এবং পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচনের লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান-সদস্যদের নির্বাচন বিধিমালা ও ভোটার তালিকা বিধিমালা (স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে) প্রণয়ন করা।

(৩) দেশের কোন সাধারণ আইন বা বিধিমালা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য হয়ে থাকলে উহা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিধানাবলী অর্থাৎ রাংগামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কার্যবিধিমালা, ২০০০ সাপেক্ষে প্রযোজ্য হবে মর্মে বিধান রাখা। যেমন- ইউনিয়ন পরিষদ আইন, উপজেলা পরিষদ আইন, পৌরসভা আইন, বন আইন প্রভৃতি আইনে উক্ত বিধান সংযোজন করা।

(৪) বিশেষ কার্যাদি বিভাগ কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০ সম্পূর্ণ বহাল এবং কার্যকর থাকবে মর্মে ২৯/১০/১৯৯০ তারিখ যে স্মারক জারী করা হয়েছে তা বাতিল করা এবং পরিবর্তে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কার্যবিধিমালা, ২০০০ এর বিধানাবলী সাপেক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯০০ কার্যকর থাকবে মর্মে পুনরায় নতুন স্মারক জারী করা।

(৫) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর চুক্তিকে লঙ্ঘন করে অনেক নির্দেশাবলী জারী করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের স্বার্থে এ সব নির্দেশাবলী প্রত্যাহার করা দরকার। নিম্নে কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হল-

(ক) সেনাবাহিনীর উপর পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নে সহায়তার দায়িত্ব অব্যাহত রাখার জন্য জারীকৃত 'অপারেশন উত্তরণ' এর আদেশ প্রত্যাহার করা।

(গ) তিন পার্বত্য জেলা প্রশাসকরাও পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান করতে পারবেন মর্মে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে ২১ ডিসেম্বর ২০০০ তাখিে দেয়া অফিস আদেশ প্রত্যাহার করা।

৩.৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটি কার্যকরকরণ

১৯৯৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতিসহ তিন সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি ১৯৯৮ হতে ২০০১ পর্যন্ত মোট ৫ (পাঁচ) টি বৈঠক করে। ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণার্থে কমিটির আহ্বায়ক এবং অপর একজন সদস্য টাস্ক ফোর্স চেয়ারম্যান পদত্যাগ করলে উক্ত কমিটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

নিজস্ব কোন কার্যালয় ও কর্মকর্তা-কর্মচারী না থাকায় উক্ত কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ অধিকাংশই অদ্যাবধি কার্য়কর হতে পারেনি।

বিগত ২৫ মে ২০০৯ তারিখে জাতীয় সংসদের মাননীয় উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধূরীকে আহ্বায়ক নিযুক্ত করে উক্ত কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি যথাক্রমে ১৮ আগস্ট ২০০৯ ও ২৬ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে সভা করেছে। দ্বিতীয় সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি কমিটির জন্য আলাদা কার্যালয় ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। উক্ত সভাসমূহে চুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে তবে নির্দিষ্ট কোন ধারা বা বিষয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি।

এমতাবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটির জন্য আলাদা কার্যালয় ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করা এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চুক্তির বিষয়াবলী বাস্তবায়ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও যথাযথভাবে কার্যকর করা আবশ্যক।

৩.৪। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা

ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় ও বাস্তব প্রয়োজনে দেশের সংবিধানের আওতাধীনে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে জনপ্রতিনিত্বিশীল ও গণতান্ত্রিক বিশেষ শাসন কাঠামো প্রবর্তনের বিধান করা হয়েছে। এ শাসন কাঠামোতে সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধানাবলী অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অঞ্চল পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে। কিন্তু এ বিশেষ শাসন কাঠামো বা শাসনব্যবস্থা অদ্যাবদি যথাযথভাবে কার্যকর হতে পারেনি। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামে শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিরোধার্থক বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব সৃষ্টি হয়েছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিস্থিতির অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা যথাযথভাবে সমাধানের পরিবর্তে দিন দিন চরম অনিশ্চয়তার দিকে ধাবিত হতে চলেছে। বিশেষত স্থানীয় জনগণের যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্বশীল কার্যকর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অনুপস্থিতির কারণে পাহাড়-পর্বতময় পার্বত্য চট্টগ্রাম মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদের আস্তানায় পরিণত হবার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

৩.৪.১। পার্বত্য জেলা পরিষদ

(১) ১৯৯৮ সালে রাংগামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ, ১৯৮৯ সংশোধন করা হয়েছে। কিন্তু পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ কার্যবিমিালা, ১৯৮৯ সরকার চুক্তি অনুযায়ী আজো সংশোধন করেনি। ফলে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ একদিকে যথাযথভাবে ইহাদের ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে; অপরদিকে কোন কোন ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদ সম্পর্কিত বিধান ইহাদের আইনে উল্লেখ নেই এ অজুহাতে আঞ্চলিক পরিষদকে উপেক্ষা করে থাকে।

(২) প্রত্যেক পার্বত্য জেলা পরিষদ চুক্তির আলোকে সংশোধিত আইন অনুযায়ী মোট ৩৩টি বিষয় বা কার্যাবলী (৬৮টি কর্ম) পরিচালানার অধিকারী। তন্মধ্যে সরকার ১৯৮৯-১৯৯২ সালে ১০টি বিষয় বা কার্যাবলীর আংশিক কর্ম, জনবল ও অর্থসম্পদসহ ১৫টি প্রতিষ্ঠান বা দপ্তর এবং ১৯৯৭-২০০৯ (মে) পর্যন্ত ২টি বিষয় বা কার্যাবলী ও ৬টি প্রতিষ্ঠান বা দপ্তর ইহাদের নিকট হস্তান্তর করেছে। সকল কার্যাবলী ও প্রতিষ্ঠান হস্তান্তরিত না হওয়ায় পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ এখনো যথাযথভাবে কার্যকন হয়ে উঠতে পারেনি। বিশেষত ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, আইন-শৃঙ্খলা তত্বাবধান, সংরক্ষণ ও উন্নতি বিধান, পার্বত্য জেলা পুলিশ, মাধ্যমিক শিক্ষা, মাতৃভায়ার মাধ্যমে শিক্ষা, রক্ষিত নয় এমন বন, জুমচাষ প্রভৃতি হস্তান্তরিত না হওয়ায় পার্বত্য জেলাসমূহে ভূমি বেদখল বন্ধকরণ, আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ তথা উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিতকরণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(৩) আইনে অ-উপজাতীয় (বাঙালী) স্থায়ী বাসিন্দা সংক্রান্ত সংজ্ঞা সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু তদনুযায়ী যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা অনুসরণ অদ্যাবধি অনুপস্থিত। বরঞ্চ স্থায়ী বাসিন্দা নয় এমন অ-উপজাতীয় ব্যক্তিদের কোন না কোনভাবে স্থায়ী বাসিন্দা করার জন্য ভূমি বন্দোবস্তের দলিল সরবরাহ ও স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র প্রদান চলে আসছে।

(৪) ২০০০ সালে সরকার “রাংগামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নির্বাচন বিধিমালা, ২০০০” এবং স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য জেলা পরিষদ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করার লক্ষ্যে “রাংগামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ ভোটার তালিকা বিধিমালা, ২০০০” এর খসড়া প্রস্তুত করে এবং আইন অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ ইহাদের উপর সুপারিশমালা পেশ করে। কিন্তু উক্ত বিধিমালাসমূহ সরকার অদ্যাবধি প্রনয়ন করেনি।

(৫) পার্বত্য জেলা পরিষসমূহ কর্তৃক প্রণীত ও অনুমোদিত বাজেট সরকার কর্তৃক আইন বহির্ভূতভাবে কাটছাঁটকরণ অব্যাহত রয়েছে।

(৬) আইন অনুযায়ী পার্বত্য জেলা পরিষসমূহ ইহাদের আওতাধীন বিষয় বা কার্যাবলীর উপর নিজস্বভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে এবং ইহাদের আওতাধীন কার্যাবলী সংশ্লিষ্ট জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম ইহাদের মাধ্যমে বাস্তবায়নের বিধার রয়েছে। তা সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর এখনো পর্যন্ত অনুসরণ করেনি।

(৭) আইন অনুযায়ী পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা, উন্নয়ন ও এনজিও বিষয়ে পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কিন্তু বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল হতে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহকে ক্ষমতায়নের পরিবর্তে নানাভাবে ক্ষমতাহীন করার অপচেষ্টা চলছে।

৩.৪.২। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

(১) ১৯৯৮ সালে চুক্তি মোতাবেক সরকার ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮’ প্রণয়ন করে এবং অন্ত র্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করে। ২৭ মে ১৯৯৯ তারিখে বর্তমান অর্ন্তবর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ দায়িত্ব গ্রহণ করে।

(২) আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক ইহার আইনের ২২ ধারায় বা প্রথম তফসিলে বর্ণিত পার্বত্য জেলাসমূহের সাধারন প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেওয়ায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর, পার্বত্য জেলা পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ যাতে আঞ্চলিক পরিষদকে সহযোগিতা করে সে বিষযে মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ হতে ১৯৯৯ সালে এক পরিপত্র দেওয়া হয়। কিন্তু এতেও কোন কাজ হয়নি। ফলে আঞ্চলিক পরিষদ ইহার কার্য সম্পাদন ক্ষেত্রে প্রায়ই অকার্যকর হয়ে পড়েছে।

(৩) ২০০০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় “পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কার্যপ্রণালী বিধিমালা, ২০০০” এর খসড়া প্রস্তুত করে এবং আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক পেশকৃত সুপারিশমালার উপর বৈঠক করে উক্ত খসড়া ২০০১ সালে চূড়ান্ত করে। কিন্তু সরকার তা এখনো প্রণয়ন করেনি। ২০০০ সালে আঞ্চলিক পরিষদ ইহার কার্যপ্রণালী প্রবিধানমালা, ২০০০ প্রণয়ন করে এবং পরামর্শ পাবার জন্য আইন অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ

করে। সরকার হতে আঞ্চলিক পরিষদকে এখনো কোন পরামর্শ দেওয়া হয়নি। ফলে আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক ইহার ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে রয়েছে।

(৪) আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক প্রণীত ও অনুমোদিত বাজেট বরাবরই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিধিহির্ভূতভাবে কাটছাঁট করা হয়ে আসছে। ফলে আঞ্চলিক পরিষদ বাজেট মূলত রাজস্ব খাত সম্বলিত হওয়ায় ইহাতে অত্যন্ত অসুবিধা দেখা দিয়ে থাকে। তবে আঞ্চলিক পরিষদ প্রতিনিধিদল কর্তৃক বিষয়টি আলোচনার প্রেক্ষিতে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের বাজেট কাটছাঁট করা হয়নি বলে জানা গেছে।

(৫) ৬ জুন ১৯৯৯ সালে আঞ্চলিক পরিষদ "পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা প্রবিধানমালা, ১৯৯৯" প্রণয়ন করে এবং পরামর্শ পাবার জন্য আইন অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। বিষয়টি অদ্যাবধি অনিস্পন্ন রয়ে গেছে।

(৬) জাতীয় সংসদ বা সরকার কর্তৃক আঞ্চলিক পরিষদ বা পার্বত্য চট্টগ্রাম সংশ্লিষ্ট কোন আইন, বিধিমালা বা নীতিমালা প্রনয়ণ ক্ষেত্রে ইহার আইন অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ সুপারিশমালা পেশ করতে পারে। বিষয়টি কোন কোন ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদকে উপেক্ষা করা হয়ে থাকে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে প্রণীত আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের সাথে উহাদের সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি বেড়ে চলেছে। যেমন- ইউনিয়ন পরিষদ আইন, উপজেলা পরিষদ আইন, পৌরসভা আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশ গ্রহণ করা হয়নি এবং আইনগত সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি অব্যাহত রয়েছে।

৩.৫। পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী

৩.৫.১। পুনর্বাসন

(১) ৯ মার্চ ১৯৯৭ তারিখে স্বাক্ষরিত ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তি মোতাবেক সরকার ১২,২২২ পরিবারের মোট ৬৪,৬০৯ জন পাহাড়ী শরণার্থীকে স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসে এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক সুবিধাদি প্রদান করে। তবে ৯৭৮০ পরিবার ধান্যজমি, বাগান-বাগিচা ও বাস্তুভিটা ফেরৎ পায়নি এবং তাদের ৪০টি গ্রাম সেটেলারদের দখলাধীনে রয়েছে।

(২) ২০০০ সালে টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে ৯০,২০৮ পরিবারকে আভ্যন্তরীণ পাহাড়ী উদ্বাস্তু হিসাবে নির্দিষ্টকরণ করা হয়েছে। চুক্তি বহির্ভূতভাবে ৩৮,১৫৬ অউপজাতীয় সেটেলার পরিবারকে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসাবে সরকার পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রামের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিলে অচলাবস্থা দেখা দেয়। এ প্রেক্ষিতে সেটেলার বাঙালীদেরকে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ কর্তৃক ১৯-০৭-১৯৯৮ তারিখে প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের নিকট প্রেরিত পত্র প্রত্যাহার করা আবশ্যক।

(৩) চুক্তি মোতাবেক জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে পূর্বে চাকুরীতে ছিলেন এমন ৬৪ জনকে পুনর্বহাল করা হয়েছে। তবে তাদের অনুপস্থিতিকালীন সময়কে কোয়ালিফাইং সার্ভিস হিসেবে গণ্য করা, জ্যেষ্ঠতা প্রদান, বেতন স্কেল নিয়মিত করা ও সংশ্লিষ্ট ভাতাদি প্রদান বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। জনসংহতি সমিতির সদস্যদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৮ সনের জুন-জুলাই মাসে জমা দেয়া ১৪২৯টি আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প এখনো সরকার ঝুলিয়ে রেখেছে। জনসংহতি সমিতির ৪ জন সদস্যের মোট ২২,৭৮৩ টাকার ঋণ মওকুফ এখনো বাস্তবায়িত হয়নি।

৩.৫.২। ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি

(১) ১৯৯৯ সালে সরকার হাইকোর্ট ডিভিশনের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে ভূমি কমিশন গঠন করে।

(২) ২০০১ সালে সরকার "পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১" প্রণয়ন করে। উহাতে চুক্তির সাথে বিরোধার্থক ধারা অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তা কার্যকর হতে পারেনি। উক্ত আইন সংশোধনের জন্য আঞ্চলিক পরিষদ ০৭ মে ২০০৯ তারিখে পুনরায় সুপারিশমালা পেশ করে। গত ২৬ আগস্ট ২০০৯ তারিখে মাননীয় ভূমি মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় একজন সরকারী কর্মকর্তা উক্ত আইন সংশোধনের পরিবর্তে চুক্তির ধারা পরিবর্তনের অভিমত তুলে ধরে এবং ইহাতে আঞ্চলিক পরিষদ প্রতিনিধিধদল আপত্তি জানায়। মন্ত্রী মহোদয় সভা মূলতুবী করেন।

(৩) রাবার চাষের ও অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য বরাদ্দকৃত যে সকল জমি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়নি সে সকল জমির ইজারা বাতিল করান জন্য সরকার ১৯৯৯ সালে পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকদেরকে নির্দেশনা প্রদান করে। উক্ত বিষয় কার্যকরকরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন প্রায় ৪৫,০০০ একর হতে ২০০৯ পর্যন্ত প্রায় ১৬,০০০ একর জমির ইজারা সরকার বাতিল করেছে।

(৪) সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এখনো যথাযথভাবে কার্যকর করেনি।

এমতাবস্থায়, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ সংশোধন, ইজারা বাতিল ও পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা আবশ্যক।

৩.৫.৩। সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অস্ত্র জমাদান

(১) ১৯৯৮ সালে সরকার জনসংহতি সমিতির সদস্য এবং সমিতির কাজে জড়িত পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা দেয়। সমিতি সকল অস্ত্রশস্ত্র সরকারের নিকট জমা দেয় এবং ইহার সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করে।

(২) সংশ্লিষ্ট জাতীয় সংসদ সদস্যের সভাপতিত্বে সমিতির সদস্য এবং সমিতির কাজে জড়িত ব্যক্তিরে বিরুদ্ধে রুজুকৃত সকল মামলা প্রত্যাহার করার জন্য তিন জেলায় তিনটি কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটিসমূহ ৭২০টি মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মামলা প্রত্যাহরের উক্ত সিদ্ধান্ত এখনো যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়নি।

৩.৫.৪। অস্থায়ী ক্যাম্প সরিয়ে নেয়া

(১) চুক্তির স্বাক্ষরের পর তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পাঁচ শতাধিক ক্যাম্পের মধ্যে ৩১টি ক্যাম্প প্রত্যাহারের চিঠি জনসংহতি সমিতির নিকট হস্তগত হয়েছে।

(২) অতি সম্প্রতি এক ব্রিগেড সৈন্যসহ ৩৫টি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং আইএসপিআর দাবী করছে যে, এযাবৎ ২০০টি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন কোন ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে তার তালিকা সম্বলিত কোন চিঠিপত্র জনসংহতি সমিতির হস্তগত হয়নি।

(৩) চুক্তি মোতাবেক ৬টি স্থায়ী সেনানিবাস বাদে অন্যান্য সকল অস্থায়ী সেনা, আনসার, ভিডিপি ও এপিবি ক্যাম্প সরিয়ে নেয়া এবং 'অপারেশন উত্তরণ' প্রত্যাহার করা আবশ্যক।

৩.৫.৫। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১) ১৯৯৮ সালে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করে এবং উহাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে নির্বচিত জাতীয় সংসদ সদস্যকে মন্ত্রীপদে নিয়োগ প্রদান করে। যথারীতি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে। কিন্ত পরবর্তীতে সরকার তা লঙ্ঘন অব্যাহত রেখেছে। বর্তমান সরকারও উক্ত মন্ত্রণালয়ে কেবল প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ করেছে। উক্ত মন্ত্রণালয়ের কার্যাদি সম্পাদন তথা চুক্তি বাস্তবায়ন স্বার্থে উক্ত মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর পদ পূরণ করা আবশ্যক।

৩.৫.৬। অন্যান্য বিষয়াবলী

(১) পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল প্রকার চাকুরীতে পাহাড়ীদের (উপজাতীয়) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ প্রদান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিধান নিয়োগবিধিমালা/প্রবিধানমালায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ২০০০ সালে নির্দেশনা দেয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ এর বিপরীত পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে। বিষয়টি সম্পর্কে পুনরায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বহুমুখী প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পার্বত্য চট্টগ্রামের সম্পদ লুন্ঠনের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্তদের অর্থনৈতিক স্বার্থ, উগ্র জাতীযতাবাদী ও উগ্র ধর্মান্ধতামুলক সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং আন্তর্জাতিক মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদী নীতির প্রভাব ইত্যাদি। সর্বোপরি, সরকারের মূল নীতি নির্ধারকদের মধ্যেকার মনোযোগ ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে এ যাবৎ প্রধান বাধা হিসেবে সক্রিয় রয়েছে।

৪.১। অর্থনৈতিক স্বার্থ

পার্বত্য চট্টগ্রামের সম্পদই সেখানকার আদিবাসী পাহাড়ী বা জুম্মদের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্রিটিশ উপনিবেশিক আমল হতে পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ ও কৃষিজ সম্পদ আহরণ বা লুন্ঠন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের হাটে-বাজারে শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় ক্ষেত্রে একচেটিয়া আধিপত্য সমতলবাসীদেরকে আকর্ষণ করে এসেছে। পাকিস্তান আমলে উক্ত সম্পদের সাথে মৎস্যজ ও উদ্যানজাত সম্পদ আহরণ বা লুণ্ঠণ ও ভূমি জবরদখল এবং পাশাপাশি সরলপ্রাণ আদিবাসীদের উপর দূর্নীতিগ্রস্থ সরকারী আমলাদের অন্যায় শাসন-শোষণ পরিচালনার অতি সহজ সুযোগ সেই আকর্ষণ আরো বাড়িয়ে তুলে। বাংলাদেশ আমলে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে সমতলবাসীদের বসতি স্থাপন ও ভূমি বেদখল পরিকল্পনা এবং বিশেষত সংঘাতমূলক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য নানা ধরণের ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের নামে অনেকাংশে নিরীক্ষামুক্ত অর্থ ব্যয় উক্ত অর্থনৈতিক স্বার্থকে আরো সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী করে তুলে। ফলে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অর্থ উপার্জনের নির্বিঘ্ন উর্বর ক্ষেত্র হয়ে উঠে। পার্বত্য

চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন এ সুবর্ণ সুযোগের অবসান ঘটাতে পারে বিধায় এ অর্থনৈতিক স্বার্থের সাথে সম্পৃক্ত মহল নানা আছিলায় সর্বাত্মকভাবে তাদের বিরোধিতা অব্যাহত রেখেছে।

৪.২। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী

পাকিস্তান শাসনামল হতে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের প্রতি সরকারী পর্যাযে বিমাতাসুলভ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিস্ফুরণ শুরু হয়। ১৯৭১ সালে এ দেশের ভৌগলিক মানচিত্রের পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই কিন্তু সরকারী নীতি নির্ধারকদের অনেকের মন-মানসিকতার মানচিত্র তেমন পরিবর্তন হয়নি। বরঞ্চ নূতন জাতি হিসাবে অভ্যুদয়ের উন্মাদনায় অনেকের কাছে জাত্যাভিমানপ্রসুত অবহেলা ও উপেক্ষার মনোভাব আরো জোরদার হয়ে উঠেছে। তদুপরি, দীর্ঘকালব্যাপী সশস্ত্র সংঘাতমূলক পরিস্থিতি অনেকের মনে গভীরভাবে জাতিগত প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধপরায়তার উন্মেষ ঘটিয়েছে। অপরদিকে, সেই একই মনোভাব ধরে রেখে দেওয়ার জন্য সরকারী ও বেসরকারীভাবে নানা মহলে এখনো প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে, চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে রাজনৈতিক দল ও সরকারের সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে অনেকের মনে বিরোধিতার দৃষ্টিভঙ্গী এখনো সচল রয়েছে।

৪.৩। মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদী নীতির প্রভাব

সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বিশেষত গণতন্ত্রকে রুখে দাঁড়ানোর জন্য এর নীতি নির্ধারকরা যেখানে সম্ভব সেখানে এর প্রভাব বিস্তারের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ দেশেও মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদী শক্তি জায়গা করে নিয়েছে। ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের প্রতি বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন সরকারের বিভিন্ন মহলের পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগে এ শক্তির পক্ষে পাহাড় পর্বতময় পার্বত্য চট্টগ্রামকে উর্বর ও অনুকুল ক্ষেত্র হিসাবে পেতে তেমন কোন বেগ পেতে হয় নি। এ শক্তি এখন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নানা বেশে ও আবরণে চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে চলেছে।

৪.৪। নীতি নির্ধারকদের মনোযোগ ও সদিচ্ছা

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের প্রতি বিরূপ মনোভাব বিভিন্ন স্তরে যথেষ্ট শক্তিশালী বিধায় কার্যত অত্যন্ত সীমিত পর্যাযে আলোচনার মাধ্যমে তদানীন্তন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। অনুরূপভাবে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মূল নীতি নির্ধারকদের ঐকান্তিক মনোযোগ ও যথাযথ সদিচ্ছা ব্যতিরেকে চুক্তি বাস্তবায়নের সময়োচিত অগ্রগতি কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। অথচ, তা বরাবরই অপর্যাপ্ত বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

৪.৫। অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা

অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বা সংস্থায় আদিবাসী নেতৃবৃন্দের কার্যকর উদ্যোগ ও যথাযথ পদক্ষেপের অভাব উল্লেখ করা যেতে পারে।

৫। উপসংহার

রাষ্ট্রনায়কোচিত যে সাহসিকতায় ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল সেই একই রকম বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সরকারের মূল নীতি নির্ধারকদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথভাবে বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে আসতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক সুশাসন প্রতিষ্ঠা, গণমুখী ও পরিবশমুখী সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ এবং সর্বোপরি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ব্যতিরেকে অন্য কোন বিকল্প নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এখনই উপযুক্ত সময়। তাই সরকারের তরফ থেকে বাস্তবায়নের রোডম্যাপ ঘোষণা পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়টি অগ্রাধিকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া আবশ্যক। সে সাথে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন ও সহায়তা চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

****